মানসিক স্বাস্থ্য

আমরা মন খারাপ করি, রেগে যাই, ভয় পাই, অথবা ঘটনাচক্রে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ি। আমাদের জীবনে এ ধরণের অনুভূতি অনেক সময়ই ঘটে। কখনও যদি খুব বিচলিত হয়ে পড়ি, বন্ধুরা আর পরিবারের লোকেরা আমাদের পাশে এসে দাঁড়ান, নেতিবাচক মনোভাব কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করেন। কিন্তু অনেক সময় পরিবারের লোক বা বন্ধুরা চেষ্টা করেও আমাদের মানসিক কষ্ট লাঘব করতে পারে না। সেই সব সময়ে আমাদের বাইরের সাহায্যের প্রয়োজন হয়। এই সাহায্যের উৎস কোন কাউন্সেলার, স্বয়ং সাহায্য গোষ্ঠী (সেলফ হেল্প গ্রুপ), বা মনোরোগবিশেষজ্ঞ হতে পারেন।

মনের অসুখের জন্যে কার কাছে যেতে হবে তা অনেক সময়েই আমরা জানি না। মানসিক অসুস্থতা এমনই রোগ যে রুগীর কাছে সেটা অনেক সময়ে স্পষ্ট হয়ে ওঠে না। আবার পরিবারের লোকেরা সহানুভূতিশীল হয়েও এগুলো ঠিক ধরতে পারেন না। আসলে মনের অসুখকে অসুখ বলে গণ্য না করার প্রবণতা আমাদের সমাজে রয়েছে। মেয়েদের ব্যাপারে এ ধরণের মনোভাব আরও প্রকট হয়ে ওঠে। তাই কমবয়সী অবিবাহিত মেয়েদের এই অসুস্থতা দেখা দিলে অভিভাবকদের ধারণা হয় 'বিয়ে দিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে'। বস্তুতঃ শতকরা ৯০ শতাংশের বেশি মহিলা মনোরোগীরা বিয়ের পরে মানসিক ভাবে আরও বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন। সমীক্ষায় দেখা গেছে ভারতের স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিতে সাহায্যপ্রার্থীদের মধ্যে ২০ শতাংশেরই মানসিক সমস্যার জন্যে চিকিৎসা প্রয়োজন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পরিসংখ্যানে দেখা গেছে ভারতের ষাটোর্ধ জনসংখ্যার ৮.৫ শতাংশ মানসিক অবসাদে ভুগছে।

মানসিক অসুস্থতা নানা কারণে দেখা দিতে পারে। কাজের জগত, প্রিয়জনের সঙ্গে সম্পর্ক, শরীরের রোগ, ইত্যাদি নানান কিছুর সঙ্গে যুঝতে না পেরে বা কোন ব্যাপারে সামাজিক চাপ, অবহেলা, যৌন নির্যাতন বা হেনস্থা, মানসিক অত্যাচার, প্রিয়জনের মৃত্যু, বাস্তুচ্যুত হওয়া, বা জীবন–পরিবর্তনকারী কোন ঘটনা সহ্য করতে না পেরে আমরা মনের ভারসাম্য হারাতে পারি। অনেক সময়ে আপাত কারণ ছাড়াই আমরা মুষড়ে পড়ি আর এই বিষাদের জের চলে বহুদিন ধরে।

অনেক সময়ে মানসিক রোগীর মেজাজ বা মুড পরিবর্তন–চক্রের মধ্যে আবর্তিত হয়। এক এক সময়ে উত্তেজনা ও উন্মত্ততায় মন বিক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে, আবার অন্য সময়ে অহেতুক দুঃখের ভারে মন অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে। মনের এই ভাব

পরিবর্তন অনেক সময়ে ধীরে ধীরে হয় – কয়েকদিন বা কয়েক সপ্তাহের ব্যবধানে। আবার দ্রুতও হতে পারে, মাত্র কয়েক ঘণ্টা বা মিনিটের ব্যবধানে। আর মনের এই দুই অবস্থাই কয়েক ঘণ্টা থেকে কয়েক মাস পর্যন্ত চলতে পারে। অনেক সময়ে এই ধরণের ভাব পরিবর্তন দৈনন্দিন জীবনের ঘাত–প্রতিঘাতের ফল বলে মনে হতে পারে। ফলে এটা যে মানসিক সমস্যা তা নিকটজনও বুঝে উঠতে পারেন না।

যখন খারাপ সময়ের মধ্যে দিয়ে আমরা যাই, তখন যেগুলি আমাদের ভালো লাগে তা করলে মন কিছুটা উৎফুল্ল হয়। ভালো খাওয়া, ব্যায়াম করা, বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা মারা বা সিনেমা দেখা – এ সব মনে কিছুটা শান্তি আনে। এছাড়া মন খারাপের সঙ্গে বহু শারীরিক উপসর্গ জোটে যেমন, মাথা ধরা, ঘাড়ে বা কাঁধে ব্যথা হওয়া, ঘুম কম হওয়া, চোয়ালে এবং পেটে ব্যথা হওয়া, খিদে কম হওয়া, ইত্যাদি। মনে আপাত শান্তি পেলে এগুলিও কিছুটা আয়ত্তের মধ্যে থাকে।

মন খারাপের সময় কোন বন্ধু বা প্রিয়জনের কাছে তা বলে, কাঁদতে ইচ্ছে করলে কেঁদে, বন্ধুদের কাছে সহানুভূতি ও উৎসাহ পেয়ে মনের ভার অনেকটা লাঘব হয়।

মানসিক চিকিৎসকের সাহায্য নেওয়া

অনেক সময়ে হয়ত আপনার প্রিয়জন আপনাকে সাহায্য করতে পারছেন না কিংবা আপনার সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে তিনি প্রস্তুত নন, অথবা আলোচনা করেও আপনি বিশেষ কিছু উপকার পাচ্ছেন না। সেক্ষেত্রে আপনার কোনও মনোরোগচিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করা উচিত। মনোরোগচিকিৎসকের কাছে যাওয়া মানুষের অক্ষমতার নিদর্শন নয়। শারীরিক অসুখ হলে আমরা ডাক্তারের কাছে যেতে দ্বিধাগ্রস্ত হই না। সুতরাং মনের অসুখের জন্য মানসিক চিকিৎসকের কাছে যাওয়ার মধ্যে কোনও অপরাধ বা লজ্জা নেই। ব্যাপারটিকে সেই ভাবে ভাবুন।

অনেক মনোরোগচিকিৎসকের ধারণা মেয়েদের মানসিক কষ্ট লাঘব করার একমাত্র উপায় ওষুধ অথবা সাইকোথেরাপি (মনঃসমীক্ষণ), বা দুটোই। কিন্তু কিছু মনোরোগচিকিৎসক আছেন যাঁরা শুধু আপনার সমস্যাই দেখেন না, আপনার অন্তর্নিহিত শক্তি এবং সহ্য করার ক্ষমতাকেও মূল্য দেন। এইরকম মনোরোগচিকিৎসকের খোঁজ করুন।

মানসিক ভাবে সুস্থ থাকতে হলে কি কি করা দরকার তার একটি তালিকা পরে দেওয়া হল।

সুস্থ থাকার কৌশল

- ভালোভাবে খাওয়া দাওয়া করুন, ব্যায়াম বা ধ্যান করুন, বা অন্যান্য স্বাস্থ্যকর আচরণ নিয়ম করে অনুশীলন করুন। শরীর ভালো থাকলে মনও ভালো থাকবে।
- ধর্মচর্চায় অনেকে ভালো বোধ করেন। প্রার্থনা, ধ্যান, বা কোন ধর্মপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হয়ে অনেকে মন শান্ত ও সুস্থ করেন।
- সৃজনধর্মী কাজে যোগ দিন। একক ভাবে বা অন্যদের সঙ্গে গানবাজনা করুন, ছবি আঁকুন, বই পড়ুন, বা নিজের সমস্যা সংক্রান্ত ব্যাপারে বইপত্র বা ম্যাগাজিন কিংবা ইণ্টারনেট থেকে তথ্য সংগ্রহ করুন।
- সহায়তা কেন্দ্র, পাড়ার ক্লাব, বা বিশেষ সমস্যা সংক্রান্ত গোষ্ঠীর কাছে যান। আজকাল অনেক রকম গোষ্ঠী গড়ে উঠেছে যেখানে বিশেষ সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয়। এগুলির মধ্যে রয়েছে নেশা থেকে মুক্ত হবার গোষ্ঠী, বৃদ্ধদের সমস্যা, সমকামীদের সংস্থা, বিশেষ অসুখে আক্রান্ত লোকদের গোষ্ঠী ইত্যাদি। আপনার সমস্যা নিয়ে কোন বিশেষ গোষ্ঠী আছে কিনা খোঁজ নিন। সেখানে গেলে অনেক সমব্যথীদের সঙ্গে কথা বলে বৃহত্তর দৃষ্টিতে ব্যক্তিগত সমস্যার মোকাবিলা করতে পারবেন।
- নিজের বন্ধুবান্ধব এবং পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক অনেককে সুখী করে। অনেক সময়ে নিজেদের সমস্যা বলা যায় যাকে এমন লোক আমরা খুঁজি। মনের দুঃখ আর সমস্যা কাউকে বলতে পারলে মনের ভার লাঘব হয়। এমন লোক একমাত্র বন্ধু আর পরিবারের মধ্যেই পাওয়া যায়।
- সারাদিনে নিজের জন্যে অন্তত আধঘণ্টা সময় রাখুন। সেই সময়টা একান্ত ভাবে আপনার।
- সামাজিক এবং রাজনৈতিক পরিবর্তন আনুন। যে সামাজিক সমস্যায় আপনি পীড়িত হচ্ছেন, যেমন সমকামিতা, অবিবাহিত মাতৃত্ব ইত্যাদি, সেগুলি যাতে আর সমস্যা না থাকে তার জন্য সচেষ্ট হোন। যেসব গোষ্ঠী এই সমস্যার সমাধানের জন্যে আন্দোলন করছে, তাদের সঙ্গে যোগ দিন। পছন্দসই গোষ্ঠী না থাকলে অন্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করে নিজেই একটি গোষ্ঠী প্রতিষ্ঠা করুন।

মনোরোগবিশেষজ্ঞেরা থেরাপি করে থাকেন। সাধারণ ভাবে তিনি আপনার সঙ্গে একা কথা বলতে চাইবেন। তবে অনেক সময় আপনি আপনার জীবনসঙ্গী অথবা পরিবারের অন্য সদস্যকে নিয়েও বসতে পারেন। এই আলোচনার মাধ্যমে আপনি আপনার মনের কথা বলতে পারবেন, অথবা বিশেষজ্ঞের সাহায্যে মনের অনুভূতিগুলো উপলব্ধি করে প্রকাশ করতে পারবেন। এর ফলে আপনার নিজের কাছেও সমস্যাগুলো স্পষ্টতর হবে, এই সমস্যাগুলির উদ্ভব কি করে হল তাও ধীরে ধীরে বুঝতে

পারবেন। আপনার নিজের শক্তি সম্পর্কে আপনার আত্মবিশ্বাস জন্মাবে এবং মনোরোগবিশেষজ্ঞের সাহায্যে আপনি নিজেই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করতে পারবেন।

খাদ্য নিয়ে তীব্র সমস্যা (অ্যানোরেক্সিয়া নার্ভোসা, বুলিমিয়া, ইত্যাদি), মাদকাসক্তি, শিশুবয়সের সমস্যা, পারিবারিক নির্যাতন, ইত্যাদি সমস্যা গভীর ভাবে বোঝা এবং অন্তর্দৃষ্টি গড়ে তোলার ব্যাপারে থেরাপি খুবই সাহায্য করে। অনেক সময়ে থেরাপি ক্রোধ দমন করতে, বা নিরর্থক আত্মগ্লানি থেকে নিজেকে মুক্ত করতে সাহায্য করে। এছাড়া অনেক অন্যায়, অবিচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতেও থেরাপি সাহস জোগায়।

মানসিক রোগ অতিক্রম করা

প্রায় দু সপ্তাহ মানসিক হাসপাতালে থাকার পর আমি প্রতি সপ্তাহে একজন পুরুষ মনোরোগ চিকিৎসকের সঙ্গে দেখা করে খুব উপকৃত হই। মাঝে মাঝে অবশ্য বিরক্ত লাগতো, কারণ উনি মতবিরোধ এড়াতেন এবং আমার যৌন নির্যাতনের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে শুনতে চাইতেন না। কিন্তু একজন কর্তাস্থানীয় পুরুষ আমার সঙ্গে সযত্ন ব্যবহার করছেন, সম্মান দিয়ে কথা বলছেন, সেটাই ছিল আমার পক্ষে ক্ষতনিরাময়ক। এখন আমি সেই থেরাপিস্টের কাছে মাসে একদিন যাই, মনোরোগের জন্যে ওষুধ খাই, এবং প্রতিদিন ধ্যান করি। এই পরিবর্তনের জন্যেই আজ আমি ব্যস্ত উকিল হিসেবে কাজ করতে পারছি।

মাঝে মাঝে থেরাপিস্টরা অবস্থার সঙ্গে সাময়িক ভাবে মোকাবিলা করা এবং আবেগে ভারসাম্য আনার জন্যে ওষুধ দেন। ওষুধের একটা নেতিবাচক দিক আছে। তাই সবসময়ে ওষুধের বিকল্প খোঁজা উচিত। গবেষণা করে দেখা গেছে মহিলারা নিয়মিত ব্যায়াম, ধ্যান, ও নিঃশ্বাস প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ (প্রাণায়াম), এবং স্বনির্ভর সাহায্যগোষ্ঠীর (সেলফ হেল্প গ্রুপ) সঙ্গে আলোচনায় প্রচুর উপকার পান।

বিভিন্ন ধরণের থেরাপিস্ট

থেরাপিস্ট বলতে অনেক কিছু বোঝায় – কেউ বিয়ে এবং পারিবারিক সম্পর্ক বিষয়ে উপদেশ দেন (ম্যারেজ এবং ফ্যামিলি কাউন্সেলার), কেউ স্বাস্থ্য বিষয়ে (নার্স, ফিজিকাল থেরাপিস্ট), কেউ সমাজকল্যাণ বিষয়ে পরামর্শ দেন (সোশ্যাল ওয়ার্কার)। এছাড়া রয়েছেন মনোবিজ্ঞানী (সাইকোলজিস্ট), মনঃসমীক্ষক (সাইকো–অ্যানালিস্ট), এবং মনোরোগ–চিকিৎসক (সাইকিয়াট্রিস্ট)। ঠিক কার কাছে গেলে আপনার কাজ হবে তা বুঝতে হলে এঁদের কর্মক্ষেত্র সম্পর্কে আপনাকে জানতে হবে। আপনি যদি কোন 'ফোবিয়া' বা অযৌক্তিক ভীতিতে ভোগেন

(যেমন ভীড়ে যেতে ভয়, ভূতের ভয়, ইত্যাদি), তাহলে মনঃসমীক্ষক বা বিহেভিওরাল থেরাপিস্টের সাহায্য নিলে আপনি উপকার পাবেন। আবার মানসিক অসুস্থতার জন্যে আপনাকে যদি ওষুধ খেতে হয় বা মানসিক হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়, তাহলে আপনার মনোরোগ–চিকিৎসকের কাছে যাওয়া দরকার।

সমাজকল্যাণ থেরাপির কাজ যাঁরা করেন তাঁরা ব্যক্তিগত সমস্যাকে দেখেন পরিবার এবং সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে। মনোবিজ্ঞানীরা বিভিন্ন মনোসমীক্ষার উত্তর বিশ্লেষণ করতে পারেন এবং মনোবিজ্ঞানী হিসেবে থেরাপি করতে পারেন। মনোরোগচিকিৎসকেরা বিভিন্ন ওষুধ দিয়ে মানসিক অসুখের চিকিৎসা করতে পারেন। ফ্যামিলি থেরাপিস্টেরা বিবাহ, বিবাহ–বিচ্ছেদ, পারিবারিক সমঝোতা, সন্তানপালন সংক্রান্ত ব্যাপারে সাহায্য করেন।

বিভিন্ন থেরাপিস্ট বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে সাহায্য করেন। এঁদের ফি বা চার্জ বিভিন্ন এবং যাঁদের স্বাস্থ্য–বীমা আছে তাঁরা অনেক সময় এই ফি বীমা থেকে পেতে পারেন। তবে খরচ করার আগে বীমা কোম্পানীকে জিজ্ঞেস করে নেওয়া ভাল। মনের রোগ সাধারণত চট করে সারে না। ওষুধ খেয়ে আপাত ভাবে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হলে, সম্পূর্ণ সারাতে বহুদিন ধরে থেরাপি চালাতে হয়। অনেক সময়ে বেশ কয়েক বছর ধরে মনোসমীক্ষণ করতে হতে পারে। সুতরাং মনে রাখতে হবে যে মনোরোগের চিকিৎসা খরচ–সাপেক্ষ।

তবে সব থেকে জরুরী একজন মানসিক স্বাস্থ্য কর্মীকে খুঁজে বার করা যিনি সঠিক পরামর্শ দিতে পারবেন।

কলকাতা ও নিকটবর্তী অঞ্চলের কিছু মানসিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র

ন্যাশনাল ইন্সটিট্যুট অফ বিহ্যভিওরাল সায়েন্সেস (নিবস)
৭ সি আই টি রোড
মৌলালী, কলকাতা ৭০০ ০১৪
(টেলি) ৩২৫৭–৫৪১১, ২২৮৬–৫২০৩, ২২৬৫–৮৬৬২
যোগাযোগ: ডাঃ কেদার রঞ্জন ব্যানার্জি
(সেল) ৯৮৩০০–২৭৯৭৬

আসানসোল অফিস:
৫০ জি টি রোড (পশ্চিম)
আপকার গার্ডেন, বর্ধমান
পশ্চিমবঙ্গ ৭১৩ ৩০৪
(টেলি) ০৩৪১–২২৫২৯৬০

শিলিগুড়ি অফিস:
চম্পাসারি
দার্জিলিং, পশ্চিমবঙ্গ ৭৩৪ ৪০৩
(টেলি) ০৩৫৩–২৫২৬১৬০

অঞ্জলি
৯৩/২ কাঁকুলিয়া রোড
বেণুবন, এ/৩০২
কলকাতা ৭০০ ০২৯
(টেলি) ২৪৬১–০৪৪৯/০২৪১

পি–২৩ দরগা রোড
কলকাতা ৭০০ ০১৭
(টেলি) ২২৯০–৩৭১১

বিবেক চেতনা
২/৩ এ কেয়াতলা রোড
কলকাতা ৭০০ ০২৯
(টেলি) ২৪৬৪–৪১১৪

অলকেন্দু বোধ নিকেতন
পি ১/৪/১ সি আই টি স্কীম
৭–এম, ভি আই পি রোড
কাঁকুরগাছি, কলকাতা ৭০০ ০৫৪
(টেলি) ২৩২০–৪৫৬৫/৭৪৩৩/২৮৬৯

অন্তরা
পোঃ গোবিন্দপুর
২৪ পরগনা দক্ষিণ
পশ্চিমবঙ্গ ৭৪৩ ৩৫৩
(টেলি) ২৪৩৭–০৫৯৩/৮৪৮৪

মেন্টএইড
১৭ এ ব্রজেন মুখার্জি রোড
বেহালা, কলকাতা ৭০০ ০৩৪
(টেলি) ২৪৭৮–৯৫১০, ৩২৬০–৭৯২৬

পরিপূর্ণতা
১৯১২ পঞ্চসায়র রোড
পোঃ পঞ্চসায়র
কলকাতা ৭০০ ০৯৪
(টেলি) ৬৪১৭–০৩০২

সহমর্মী
ব্লক ডি, ফ্ল্যাট ১২
৯৮ কড়েয়া রোড
কলকাতা ৭০০ ০১৯
(টেলি) ২২৪০–৩৯৯৪

সেবক
১৩৫ এ বিবেকানন্দ সরণী
ঠাকুরপুকুর, কলকাতা ৭০০ ০৬৩
(টেলি) ২৪৯৭–১৮৯০/০৯৪৭

টার্নিং পয়েন্ট
যোগাযোগ: ঈশিতা সান্যাল
৪৬ যাদবপুর সেন্ট্রাল রোড
কলকাতা ৭০০ ০৩২
(টেলি) ২৪০৭–১৭৫৩, ২৪১২–৩৬৬০
(সেল) ৯৮৩০০ ৬৯১০৬

দত্তনগর মেন্টাল হেলথ সেন্টার সাইকিয়াট্রিক হাসপাতাল
দত্তনগর, বেদিয়াপাড়া
কলকাতা ৭০০ ০৭৭
(টেলি) ২৫৫৭–২৪৮২

মেন্টাল হেলথ কাউন্সেলিং সার্ভিস
পি/৯৪ কানুনগো পার্ক
গড়িয়া, কলকাতা ৭০০ ০৮৪
(সেল) ৯৯০৩০ ৪৫৪৩৪

লুম্বিনী পার্ক মানসিক হাসপাতাল
১১৫ গিরীন্দ্র শেখর বোস রোড
তিলজলা
কলকাতা ৭০০ ০৩৯
(টেলি) ২৩৪৩–৪৩৮৪

পছন্দসই থেরাপিস্ট কি করে পাওয়া যাবে?

আপনাকে এমন একজন থেরাপিস্ট খুঁজে পেতে হবে যাঁর ধরণধারণ, শিক্ষা, ব্যক্তিত্ব আপনার প্রয়োজন মেটায়। আপনার বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজনকে জিজ্ঞেস করুন তাঁরা ভাল থেরাপিস্ট কাদের চেনেন। আপনি নিজেও উদ্যোগী হয়ে মনোরোগচিকিৎসকদের খোঁজ নিতে পারেন। মনোরোগ সংক্রান্ত হাসপাতালের সঙ্গে যুক্ত মনোসমীক্ষক বা সমাজকল্যাণ কর্মীর খবর সেখান থেকে পেতে পারেন। কোন থেরাপিস্টের কাছে যাবার আগে জেনে নিন:

- তাঁরা প্রথম ভিসিটে কত টাকা নেন এবং পরের ভিসিট থেকে তাঁর ফি কত হবে। আর্থিক সঙ্গতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ফি কমানোর কোন বন্দোবস্ত তাঁর আছে কিনা জিজ্ঞেস করুন।
- জিজ্ঞেস করুন থেরাপিস্টের ট্রেনিং কি বিষয়ে? আপনার সমস্যা তাঁর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের আওতায় পড়ে কি?
- কত ঘন ঘন তাঁর কাছে যেতে হবে?

মোটকথা চিকিৎসা শুরু করার আগে চিকিৎসকের বিশেষ শিক্ষা বা স্পেশালিটি, চিকিৎসার খরচ, এবং কতদিন ধরে চিকিৎসা চলতে পারে সে সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা করে নিন। চিকিৎসা শুরু হবার পরে, আপনি যদি মনে করেন চিকিৎসকের স্টাইল বা আচারব্যবহার আপনার পছন্দ হচ্ছে না, অন্য কাউকে বেছে নিন। চিকিৎসকের প্রতি আপনার আস্থা না থাকলে বা তাঁর কাছে স্বচ্ছন্দ বোধ না করলে সুফল পাওয়ার সম্ভাবনা কম।

কি করে বুঝবেন সাহায্যকারী থেরাপিস্ট সত্যিই আপনাকে সাহায্য করছেন কিনা?

মানসিক কষ্ট ও অসুস্থতার মধ্যে জীবন কাটানো সহজ নয়। মানসিক রোগ মাঝেমধ্যে বাড়ে বা কমে – সুনির্দিষ্ট পথে এগোয় না। অনেক সময় যাঁর ভরসায় আপনি জীবনের মোড় ঘোরাতে চেয়েছিলেন, দেখলেন তিনি সেই ভরসার যোগ্য নন। আপনি যদি মনে করেন যে আপনার সাহায্যকারী বন্ধু, আত্মীয়, ধর্মগুরু, বা থেরাপিস্ট আপনার সুবিধা অসুবিধা বুঝছেন না বা আপনার মানসিক অবস্থা উত্তরোত্তর আরও খারাপের দিকে যাচ্ছে, তাহলে সাহায্যের জন্য অন্য কারোর কাছে যান। অন্ততঃ আপনার কোন সহমর্মীর কাছে এ ব্যাপারে পরামর্শ নিন।

ভালো থেরাপিস্টের একটি গুণ হল তিনি সহমর্মিতার সঙ্গে আপনার সমস্যার ব্যাখ্যা শুনবেন। হয়ত তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী আপনার থেকে পৃথক। আপনার সঙ্গে মত না মিললে তিনি আপনাকে প্রশ্ন করতে পারেন। কিন্তু সেই প্রশ্নের উদ্দেশ্য আপনাকে নস্যাৎ করা নয়, আপনাকে সাহায্য করা, যাতে আপনি নতুন ভাবে চিন্তা করতে পারেন এবং কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপ নিতে পারেন।

উচ্চশিক্ষার খেতাব বা কলেজের ডিগ্রি থাকলেই ভালো থেরাপিস্ট হয় না। একজন ভালো থেরাপিস্ট আপনাকে কতটা সাহায্য করতে পারছেন তা নির্ভর করবে মহিলাদের প্রতি তাঁর ব্যক্তিগত মনোভাব ও আপনি যে পরিবেশ এবং সমাজ থেকে আসছেন তার সম্বন্ধে তাঁর সচেতনতা ও সহানুভূতির ওপর। পৃথিবীতে মানিয়ে চলতে আপনার যে অসুবিধাগুলি হচ্ছে, তার কারণগুলি ভালো ভাবে বুঝতে পারলে তবেই থেরাপিস্ট আপনার উপকারে লাগবেন।

অনেকে মনে করেন যেসব পুরুষ বা নারী থেরাপিস্ট নিজেদের নারীবাদী বা 'ফেমিনিস্ট থেরাপিস্ট' বলে দাবী করেন, তাঁরা আমাদের সঙ্গে সম্মানজনক ব্যবহার করবেন কিংবা তাঁরা অন্যান্য থেরাপিস্টের থেকে ভালো। কে ফেমিনিস্ট থেরাপিস্ট, কে বিহেভিয়োরাল থেরাপিস্ট, কে মনোবিশেষজ্ঞ বা অন্য কোন থেরাপিস্ট, সেই বিচারের চেয়ে বড় হল আপনি তাঁর সঙ্গে মানসিক ভাবে কতটা যুক্ত হতে পারছেন সে বিষয়টি।

যদি মনে করেন কোন থেরাপিস্ট আপনার সমস্যা বুঝতে পারছে না, অথবা আপনার এই ধরণের থেরাপিস্ট–এর দরকার নেই, তাহলে যে কোন সময়ে আপনি তাঁর কাছে যাওয়া বন্ধ করতে পারেন। কিন্তু যদি মনে করেন যে থেরাপিস্ট–এর কাছে গিয়ে আপনার দুঃখ কষ্টের অনুভূতিগুলো আবার প্রকট হয়ে উঠছে তাই আপনি তাঁর কাছে আর যাবেন না, তাহলে সেই সিদ্ধান্ত ভুল হবে। আপনার সঙ্গে যদি থেরাপিস্টের সুসম্পর্ক স্থাপিত হয়ে থাকে, থেরাপি বন্ধ করা উচিৎ নয়।

অনেক সময়ে বোঝা যায়, যে থেরাপিস্টের কাছে আপনি যাচ্ছেন, আপনার সঙ্গে কাজ করার প্রয়োজনীয় দক্ষতা তাঁর নেই এবং আপনার পক্ষে তিনি উপযুক্ত নন। যেমন সেই থেরাপিস্ট যদি ধর্মীয় গোঁড়ামি পোষণ করেন বা মেয়েদের কর্তব্য সম্পর্কে রক্ষণশীল মনোভাব পোষণ করেন। এই ধরণের পক্ষপাতিত্ব থাকলে কোন থেরাপিস্টের পক্ষে মুক্তমনে মেয়েদের সাহায্য করা কঠিন।

যার সঙ্গে কাজ করছেন (ক্লায়েণ্ট) তার সঙ্গে সামাজিক সম্পর্ক স্থাপন কোন থেরাপিস্টেরই উচিত নয়। কোন থেরাপিস্ট যদি তাঁর অন্যান্য মক্কেল বা ক্লায়েণ্টের গল্প আপনার সঙ্গে করেন, নাম না বলেও এমন তথ্য আপনার কাছে প্রকাশ করেন যা থেকে আপনি বুঝতে পারছেন লোকটি কে, বা থেরাপিস্ট যদি নিজের ব্যক্তিগত কথা আপনাকে বলেন, তাহলে তিনি একান্তই অনুচিত আচরণ করছেন। থেরাপিস্ট যদি আপনার সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহ প্রকাশ করেন বা প্রেমের সম্পর্ক স্থাপনে চেষ্টা করেন, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কাছে যাওয়া বন্ধ করুন এবং থেরাপিস্ট নিয়ন্ত্রণ সংস্থা বা লাইসেন্সিং বোর্ডের কাছে ঘটনাটি রিপোর্ট করুন। যাঁরা থেরাপি করেন তাঁদের সঙ্গে বন্ধুত্ব বা প্রেমের সম্পর্ক স্থাপন করা কিংবা তাঁদের সঙ্গে কোন ব্যবসায়ে যুক্ত হওয়া অন্যায়। এই ধরণের ব্যবহার আপনার থেরাপি ও সুস্থতার পথে অন্তরায়।

থেরাপির সীমাবদ্ধতা

অনেক সময় নিজেদের চিন্তা ভাবনাকেই আমাদের খারাপ বা অনুচিত বলে হয়। তখন মনে হতে পারে আমার নিজের মধ্যেই কোন গোলমাল আছে, নইলে এ রকম বাজে চিন্তা মাথায় আসবে কেন? এইসব ভাবনা বন্ধুদেরও বলতে লজ্জা বা ভয় করতে পারে। তাছাড়া বন্ধুরা তো আর থেরাপিস্ট নয়, তারা কি করে সাহায্য করবে? কিন্তু কার কাছে যাবেন তাও ঠিক করা যায় না।

আসলে মানসিক ভাবে কে সুস্থ, কে স্বাভাবিক বা অস্বাভাবিক এই প্রশ্নের সঙ্গে 'ভালোবাসা কি?' বা 'শিল্প কি'? এই ধরণের প্রশ্নের বিশেষ কোন তফাৎ নেই। এর উত্তর একাধিক। মানসিক রোগ নিয়ে যাঁরা কাজ করেন, তাঁদের কাছে মানসিক সুস্থতা-অসুস্থতার বিভিন্ন সংজ্ঞা আছে। আমাদের মানসিক স্বাস্থ্য কী ভাবে তাঁরা পর্যালোচনা করবেন তা এই দৃষ্টিভঙ্গীর ওপর নির্ভর করে। আসলে থেরাপিস্টদের গভীর অন্তর্দৃষ্টি এবং অনুভূতির প্রয়োজন। নানান সামাজিক পরিস্থিতি এবং শারীরিক ও মানসিক অবস্থা বিবেচনা করে তাঁদের এগোতে হয়। তাই ভুলভ্রান্তি হওয়া কিছু অস্বাভাবিক নয়। একটি বিশেষ সময়ে কেউ হয়ত মনে করতে পারে আপনি মানসিক ভাবে অসুস্থ। অথচ সেটা সত্যি নাও হতে পারে। আপনি হয়ত এমন একটা দুঃসময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন যা যুঝতে আপনি পর্যদুস্ত হচ্ছেন, অথচ মনের আবেগের দিক থেকে (ইমোশনালি) আপনি সম্পূর্ণ সুস্থ। শুধু তাই নয়, গবেষণাতে দেখা গেছে সাধারণ মানুষ এবং থেরাপিস্ট দু দলই যে ধরণের আচরণ মহিলাদের মধ্যে সমস্যা হিসেবে দেখেন, সেই একই আচরণ তাঁরা পুরুষদের ক্ষেত্রে ইতিবাচক হিসেবে গণ্য করেন।

মানসিক সমস্যায় সাহায্য চাইছেন মানেই যে আপনি অসুস্থ তা নয়। ভালো থেরাপিস্ট-রা সাধারণত মনে করেন ক্ল্যায়েন্ট বা যিনি থেরাপি করাতে আসছেন তিনি নিজেকে খুব ভালো করেই বোঝেন। শুধু যে ধোঁয়াশা তাঁর মনে রয়েছে সেটুকুই কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করতে হবে। অর্থাৎ ক্ল্যায়েন্টের ওপর তাঁদের বিশ্বাস আছে।

মানসিক রোগ চিহ্নিত করা নিয়ে সমস্যা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রকাশিত 'ডায়াগ্‌নস্টিক এণ্ড স্ট্যাটিস্টিক্যাল ম্যানুয়েল অফ মেণ্টাল ডিস-অর্ডার' (ডি এস এম) বইটিতে বিভিন্ন মানসিক অসুস্থতার সংজ্ঞা রয়েছে। এই বইটি শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নয়, মানসিক রোগ চিহ্নিত করতে পৃথিবীর নানান দেশে ব্যবহার করা হচ্ছে। দুর্ভাগ্যবশত বইটি লিখেছেন শ্বেতাঙ্গ পুরুষ গবেষক এবং মনোবিজ্ঞানীরা। ফলে বইটিতে বিশ্লেষিত প্রায় ৪০০-টি বিভিন্ন মনোরোগের বর্ণনায় পুরুষতন্ত্রের প্রভাব প্রকট হয়ে ফুটে উঠেছে। নারীর

দৃষ্টিভঙ্গী উপেক্ষা করার দরুণ রোগ নির্ণয়ের এই ব্যাকরণ অনেক সময়ই মেয়েদের পক্ষে ক্ষতিকারক হয়।

আবার অনেক আবেগজনিত মানসিক অবস্থা এবং ব্যবহারকে অস্বাভাবিক বলা যেতে পারে, কিন্তু তা বলে সেগুলিকে মানসিক রোগ বলা যায় না। এই সব আবেগকে মানসিক রোগ বলে আখ্যা দিলে মেয়েদের জীবন ভয় ও লজ্জায় জর্জরিত হয়ে পড়বে। যে সমস্যার মূলে সামাজিক, রাজনৈতিক, বা সাংস্কৃতিক প্রভাব রয়েছে, তাকে ব্যক্তি বিশেষের সমস্যা বলে আখ্যা দিলে অবিচার করা হবে।

তাছাড়া কাকে কি ভাবে চিহ্নিত করা হচ্ছে সে ব্যাপারটিও অত্যন্ত ব্যক্তিনির্ভর (সাবজেকটিভ)। দুজন মানুষ একই মনোরোগে ভুগছে বলে চিহ্নিত করা হলেও তাদের মধ্যে অনেক তফাৎ থাকতে পারে। দুজনে একই চিকিৎসায় দুভাবে সাড়া দিতে পারে। আবার দুজন মানুষ এক ভাবে একই রকম সমস্যাতে ভুগলেও দুজনকে দুভাবে চিহ্নিত করা হতে পারে। একজনকে রোগগ্রস্ত আর অন্যজনকে নিরোগ বলেও ঘোষণা করা হতে পারে।

কোন মনোবিশেষজ্ঞ বা ডাক্তার আপনার মনের অসুখ আছে বলে হাসপাতালে ভর্তি করলে সেই রেকর্ড চিরস্থায়ী হয়ে থেকে যায়। এর জন্যে ভবিষ্যতে আপনার কর্মক্ষেত্রে বা অন্য জায়গায় অসুবিধা হতে পারে। আমাদের সমাজে মেয়েরা মনোরোগচিকিৎসকের কাছে গেলে তাকে পরিবারে অনেক গঞ্জনা সহ্য করতে হয়, তাকে 'পাগল' বলে আখ্যা দেওয়া হয়, এবং স্বামীর ঘরে থাকার 'অনুপযুক্ত' বলে বাতিল করা হয়। শ্বশুরবাড়ীতে মেয়েটির সম্মান মাটিতে মিশে যায়; আর 'পাগল' এই অজুহাত দেখিয়ে তাকে সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত করার চেষ্টা চলে, এমন কি বাপের বাড়িতে পাঠিয়ে দিতে প্রিয়জনেরা দ্বিধা করেন না। ডাক্তারের কাছে বৌ 'পাগল' সার্টিফিকেট নিয়ে ডিভোর্স করা, পরিত্যাগ করা, বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার ঘটনাও কম ঘটে না। ১৯১২ সালের ইণ্ডিয়ান লুন্যাসি অ্যাক্ট বাতিল করে ১৯৮৭ সালে ভারতের মানসিক স্বাস্থ্য আইন পাশ করা হয়। এই আইন অনুসারে অনেক গৃহহারা মেয়েদেরই আশ্রয় হয় মানসিক হাসপাতাল। একবার মানসিক হাসপাতালে ঢুকিয়ে দিলে সেখান থেকে মুক্তি পাওয়া প্রায় অসম্ভব। সম্পূর্ণ সেরে উঠলেও সেই মহিলাদের ঘরে ফিরিয়ে নেবার লোক থাকে না। ফলে মানসিকভাবে মেয়েদের নিজেদের অস্তিত্বের সংকট রয়েই যায়।

মানসিক অবসাদ কি আমাদের মস্তিষ্কের রসায়ন প্রসূত?

মানসিক ডিপ্রেশন বা অবসাদের মূল কারণ কি? এটা কি বাইরের জগতের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে না পেরে বা কোন দুঃখজনক অভিজ্ঞতার জন্যে ঘটছে, না এর উৎস আমাদের দেহাভ্যন্তরে? কোন ভয়ানক সমস্যা কি ভাবে আমরা মোকাবিলা করবো তা নির্ভর করে আমাদের পূর্ব অভিজ্ঞতার ওপর। সেই অভিজ্ঞতা যত

ভিন্নধর্মী হয় ততই ভাল। তবে আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানে মনের বহু সমস্যাকে মস্তিষ্কের সমস্যা বলে চটজলদি উপশমের জন্যে ওষুধের ওপরে জোর দেওয়া হচ্ছে। মস্তিষ্কে রাসায়নিক ভারসাম্যতার অভাবে নানান মনোরোগ হলেও সহজ, গতানুগতিক ওষুধে তা নাও কমতে পারে। মানসিক সমস্যাকে শুধুমাত্র মস্তিষ্কের সমস্যা বলে মনে করলে মানসিক অবসাদের ওপর সামাজিক ও রাজনৈতিক পারস্পরিক সম্পর্কের প্রভাব উপেক্ষা করা হবে। জীবনের ভয়ানক অভিজ্ঞতাগুলো আমাদের মনে যে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করে তা অস্বীকার করা যায় না। আবার মস্তিষ্কের রাসায়নিক ক্রিয়া এবং পরিবর্তনও আমাদের আবেগ এবং মেজাজের ওপর প্রত্যক্ষ প্রভাব ফেলে। সেই সঙ্গে আমাদের অনুভূতিও শরীরের রাসায়নিক প্রক্রিয়াকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। অর্থাৎ জীবনযুদ্ধে বিপর্যস্ত মানসিক অবসাদের রোগীর শরীরে রাসায়নিক পদার্থের কম–বেশি পাওয়া গেলেও বলা শক্ত কোনটা কারণ আর কোনটা ফল। শারীরিক এবং সামাজিক পরিবেশ ও অবস্থার যে নিরন্তর ঘাত–প্রতিঘাত চলে তার থেকে বোঝা কঠিন ব্যক্তিবিশেষের মানসিক সমস্যার মূলে কি রয়েছে। আমাদের দেশে আর্থিক পরাধীনতার কারণে হীনমন্যতা ও অপরাধবোধ থেকেও জন্ম নেয় মানসিক অবসাদ।

মস্তিষ্ক নিয়ে গবেষণা যত বাড়বে আমরা ততই নতুন তথ্য পাবো। কিন্তু মনে রাখতে হবে মস্তিষ্কের অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়াকে সমাজের পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া থেকে মুক্ত করে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালানো অসম্ভব। সুতরাং মনোরোগের মূল স্বরূপ উদ্ঘাটন করা যে দুরূহ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

সাইকোট্রপিক ওষুধের সমস্যা

সাধারণত মনোরোগচিকিৎসকেরা দু ভাবে রোগীর চিকিৎসা করেন – সাইকোথেরাপি করে এবং সাইকোট্রপিক ওষুধ দিয়ে। সাইকোট্রপিক ওষুধ মানুষের স্নায়ুকেন্দ্রকে প্রভাবিত করে এবং আমাদের আবেগ ও মেজাজে পরিবর্তন আনে। আজকাল অ্যান্টি–ডিপ্রেসেন্ট ওষুধ প্রায় ব্যবহার করা হয়। মনোরোগের চিকিৎসকের কাছে গেলে প্রথমেই তাঁরা ওষুধ খাওয়ার পরামর্শ দেন। শরীরের অসুস্থতার জন্যে ওষুধ খাওয়া পরিবারের লোকেরা অনেক সময় অপেক্ষাকৃত সহজে গ্রহণ করতে পারেন। কিন্তু মানসিক রোগের সেই একই চিকিৎসাতে অসুবিধে বোধ করেন। এ ধরণের ওষুধে অনেকে উপকৃত হলেও এতে কিছু সমস্যা আছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিক্রির জন্য অনুমোদন পেয়েছে SSRI(সিলেক্টিভ সেরোটনিন রি–আপটেক ইনহিবিটরস) নামে একটি ওষুধ যা প্রোজাক, প্যাক্সিল, সেলেক্সা ও অন্যান্য নামে বাজারে ছাড়া হয়েছে। আমাদের দেশেও এধরণের ওষুধের চল বাড়ছে। কিন্তু এই ওষুধটি দীর্ঘকাল ধরে পরীক্ষিত হয় নি। এর বিরূপ প্রতিক্রিয়ার মধ্যে ঘুমের অসুবিধা, হজমের গণ্ডগোল, যৌনব্যাপারে অসুবিধা, এবং আত্মহত্যা

করার প্রবণতা দেখা যায়। এই বিরূপ প্রতিক্রিয়াগুলি যতটা সম্ভব রেখে ঢেকে এগুলো এতদিন বাজারে বিক্রি করা হয়েছে। এছাড়া ওষুধগুলো খেয়ে কেউ কেউ প্রথম দিকে সুফল পেলেও, সেই প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। নিজেদের মানসিক যন্ত্রনা কমাবার জন্যে অনেক মহিলা এই ধরণের ওষুধ খেয়ে কষ্টকর সময় পার করে দেন। কিন্তু ধীরে ধীরে শরীরের ওপর এই ওষুধের ক্ষমতা কমে। যে দীর্ঘস্থায়ী সুফলের আশায় মহিলারা এই ওষুধগুলো ব্যবহার আরম্ভ করেন সেগুলি আর পাওয়া যায় না।

মানসিক অবসাদের লক্ষণগুলি হল দীর্ঘ সময় ধরে ক্লান্তি ভাব, কোনও কাজে আনন্দ না পাওয়া, জীবন অর্থহীন মনে হওয়া, খিদে কমে বা বেড়ে যাওয়া, মনঃস্থির করতে অসুবিধা হওয়া, অল্পে কেঁদে ফেলা, মনে আত্মহত্যার ভাবনা জেগে ওঠা। কিন্তু এ ধরণের লক্ষণ দেখলেই যে আপনি মানসিক অবসাদে ভুগছেন তা জোর করে বলা যায় না। অল্পবিস্তর অনেকেরই মানসিক দুঃখে ভোগার অভিজ্ঞতা রয়েছে। অবশ্য কাকে মানসিক অবসাদ আর কাকে জীবনের ঘাতপ্রতিঘাতের স্বাভাবিক প্রকাশ বলে তা নিয়ে এখনও বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। অনেক সময়ে অবসাদের লক্ষণগুলির মূলে অন্য কোন কারণ থাকতে পারে। যেমন দীর্ঘস্থায়ী ক্লান্তির মূলে হর্মোনের অসাম্যতা থাকতে পারে অথবা দারিদ্র্য।

মানসিক চিকিৎসার দরকার হলে এমন একজন ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলুন যিনি ওষুধ এবং অন্যান্য থেরাপি সম্পর্কে অভিজ্ঞ। যদি সাইকোট্রপিক ওষুধ খেতে আরম্ভ করেন, মনে রাখবেন এর ফল দেখা দিতে কয়েক সপ্তাহ লাগবে। অধৈর্য্য হলে চলবে না। অনেক সময়ে বিভিন্ন ধরণের ওষুধ খেয়ে দেখতে হয় কোনটি আপনার শরীরে সুষ্ঠু ভাবে কাজ করছে। থেরাপি করার সময়ে থেরাপিস্টকে জানাতে ভুলবেন না আপনি কি ওষুধ খাচ্ছেন।

যদি কোন ডাক্তার আপনাকে ওষুধ খেতে উপদেশ দেন, তাহলে খেয়াল করুন তিনি আপনাকে ওষুধের সুফল ও কুফল সম্পর্কে বিস্তারিত জানাচ্ছেন কিনা। আপনি নিজেও ইন্টারনেট থেকে ওষুধের গুণাগুণ সম্পর্কে জেনে নিতে পারেন। ওষুধ ছাড়াও আর কি ভাবে আপনি উপকার পেতে পারেন তা চিন্তা করুন।

কিছু কিছু ওষুধের স্বল্পকালীন বিরূপ প্রতিক্রিয়া থাকে কিন্তু দীর্ঘকালীন উপকার খুবই ভালো। এই ধরণের ওষুধ খেলে যদি বিরূপ প্রতিক্রিয়া ভয়াবহ রূপ নেয় যেমন, ভীতি বেড়ে যায়, আত্মহত্যা করার ইচ্ছে জাগে, অথবা হিংসাত্মক হয়ে ওঠেন, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারকে জানান। ডাক্তারের সঙ্গে কথা না বলে হঠাৎ নিজের থেকে ওষুধ বন্ধ করবেন না। এই ধরণের ওষুধ হঠাৎ বন্ধ করলে শরীরের ওপর ভয়াবহ প্রভাব পড়তে পারে। আগে থেকেই জেনে নেবেন ওষুধ হঠাৎ বন্ধ করলে তার কুফল কী হতে পারে। ওষুধ খাওয়া বন্ধ করতে হলে ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে করবেন।

মানসিক সমস্যার মোকাবিলা করতে ওষুধের প্রয়োজন হতে পারে। চেষ্টা করতে হবে জীবনে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন এনে বাইরের জগতকে যেন সহজ করে তুলতে পারি। তবে দীর্ঘকাল ধরে ওষুধের ব্যবহার আমাদের সত্যিকারের অনুভূতিগুলিকে ভোঁতা করে দিতে পারে।

সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রচেষ্টা: যে সহায়তা অধরা রয়ে যায়

দৈনন্দিন জীবনে রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তন আনতে বেশ কিছু সংস্থা চেষ্টা করছে। এই প্রচেষ্টা শুধু নিজদের ক্ষমতায়নের জন্যে নয়। এই সংস্থাগুলি আমাদের দুই ভাবে সাহায্য করতে পারে। প্রথমত, এরা মেয়েদের জীবনে কষ্টের বিভিন্ন উৎসের ওপর দৃষ্টি রাখে, এবং দ্বিতীয়ত, এরা আমাদের অসহায়তা এবং একাকিত্ব থেকে খানিকটা মুক্তি দেয়। এছাড়া, যেহেতু এরা বিভিন্ন পরিস্থিতিতে জড়িয়ে পড়া মহিলাদের সঙ্গে কাজ করে, আমাদের নিজেদের কখনই অস্বাভাবিক লাগে না। নিজেদের স্বাভাবিক ভাবতে আর লজ্জায় কুণ্ঠিত না হয়ে বাঁচতে এই সংগঠনগুলি সাহায্য করে। দুর্ভাগ্যবশত আমাদের দেশে এই ধরণের সংস্থার সংখ্যা খুবই কম। এই ধরণের সংগঠনের একটি তালিকা কর্মযোগ ওয়েবসাইটে পাবেন। তবে কোনও ওয়েবসাইটের সদস্য হতে হলে জেনে নেবেন কে বা কারা সেটি পরিচালনা করছেন।

তবে শুধু সংগঠনের ওপর নির্ভর করলে চলবে না, নিজেদেরও উদ্যোগ নিতে হবে। মানসিক সুস্থতার জন্যে তৈরী করতে হবে সুস্থ সমাজ। তাই মানসিক ভাবে সুস্থ থাকতে হলে আগে পরিবেশ, পরিবার, ও কর্মক্ষেত্রে সুস্থতার চেতনা আনতে হবে। তার জন্যে সমাজে প্রত্যেকেরই সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়া প্রয়োজন।